স্বর্গ হইতে পতন

এবারকার থীম হ'ল স্বর্গ হইতে পতন। বড় গিন্নী মিসেস সিকদারের আইডিয়া এটা। অন্যরা আরও অনেক থীম সাজেস্ট করেছিল। নৌকাডুবি, অগ্নিকাণ্ড, সাউথ প্যাসিফিক, নিউডিস্ট কলোনিতে একটি সন্ধ্যা, সমুদ্রতটে রৌদ্রস্নান। কিন্তু শেষ অবধি আদম-ইভের দূর্গতিটাই মনে ধরলো মিসেস সিকদারের। রৌদ্রস্নানটাও মন্দ নয়। কিন্তু গতবছর হয়ে গেছে সেটা, ওঁর পূর্বগামী মিসেস বক্সির আমলে। সে নাকি এলাহি কাণ্ডকারখানা করেছিলেন মিসেস বক্সি। উত্তরলাই থেকে ট্রাকবোঝাই বালি আনানো হয়েছিল ক'দিন ধরে। সেই বালি সমান করে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল মেসের প্রশস্ত লন জুড়ে। কিছু দূরে দূরে নানা শেডের বড় বড় ছাতা পুঁতে তার নীচে হাজবেণ্ডদের খানাপিনার জমজমাট আয়োজন। আর লনময় বালির উপর যত্র তত্র বিকিনি পরে শুয়ে বসে নানান পোজে নিওনলাইটে রৌদ্রস্নানরত মহিলারা সব। দারুণ জমেছিল গতবছরের হাজবেণ্ডস্ নাইট। মিসেস বক্সির প্রশংসায় এখনও শতমুখী এলাকার মহিলা পুরুষ, তাবৎ অফিসার দম্পতি।

মিসেস সিকদার বিতৃষ্ণায় ঠোঁট বাঁকালেন। এসব আদিখ্যেতা দেখলে গা জ্বলে যায় তাঁর। যেন বিশ্বসংসারের যতেক গুণরাশি ঐ মিসেস বক্সিতেই কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। উনিও দেখিয়ে দেবেন। অর্গানাইজিং ও কেটারিং এ তাক লাগিয়ে চমৎকৃত করে দেবেন ক্যাম্পের অপামর জনতাকে। সর্বপ্রথম একটি সুবৃহৎ কার্যসূচী বানালেন মিসেস সিকদার। পার্শ্বচর মিসেস ভাণ্ডারকর ও মিসেস মুখুটিও সাহায্য করলেন। ওঁরা এ তল্লাটের মেজ ও সেজ যথাক্রমে ---- স্বামীদের পদে, মানে, মাহিনায়। মুখ্য কাজগুলো চাঁই চাঁই গিন্নীদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে বাকি ছুটকো কাজ মাপে ছোট মহিলাদের মধ্যে বিলি করে দিলেন মিসেস সিকদার। নিজের হাতে রাখলেন সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের কলকাঠি নাড়ার দায়িত্বভার, এতগুলি মহিলাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানোর কাজ। কর্ণধারের কাজও কিছু কম নয়। অষ্টপ্রহর টেলিফোনের রিসিভার কর্ণে ধারণ করে থাকা।

নামিয়ে রাখতে না রাখতেই আবার বেজে ওঠে।

ক্রিং, ক্রিং, ----। মিসেস পাকড়াশি আকুল কন্ঠে শুধোলেন, “হ্যাঁ দিদি, মাথা পিছু কটা করে পানের পাতা লাগবে?”

মিসেস পাকড়াশির সাধারণবুদ্ধির অভাব দেখে দারুণ বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকোলেন মিসেস সিকদার। “কেন? মেয়েদের তিনটে আর পুরুষদের একটা। আপনি বুঝি freak-দের কথা ভেবে সারা হচ্ছেন? ভয় নেই, হাজবেণ্ডস্ নাইটে তেমন কেউ আসবে না।”

মিসেস সিকদারের মধুক্ষরা হুলের দংশনে চোখমুখ লাল হয়ে গেল মিসেস পাকড়াশির। সেটা দেখতে না পেলেও উপলব্ধি করতে পারলেন মিসেস সিকদার এবং দারুণ আত্মপ্রসাদ অনুভব করলেন মনে মনে। কিন্তু সে আরাম মুহূর্তের। সঙ্গে সঙ্গে আবার টেলিফোন বাজলো। এবার মিসেস মুখুটি।

“দিদি, গার্ডেন অফ ইডেনে যে আপেলগুলো ঝুলবে তার মধ্যে একটা করে টফি দেবো, না বাবল্ গাম?”

“আরে ভাই আপনার যা মন চায় দিন। ড্রিংক গিলে নেশায় চুর হয়ে থাকবে সবাই। প্যারি না মর্টন, টফি না চকোলেট সে সব খেয়াল করার মত হুঁশ থাকবে না কারও, পরিবেশও। আপনার ওই গাছে লটকানো আপেলের থেকেও অনেক বেশী আকর্ষক চীজ রাখবো চতুর্দিকে, বুঝলেন!”

কণ্ঠে চেষ্টাকৃত কৌতুকের রেশ টেনে ফোন নামিয়ে রাখলেন মিসেস সিকদার। এই বোকাটে মেয়েমানুষগুলোকে দিয়ে কোন কাজ করানো যে কি ঝকমারি তা একমাত্র তিনিই জানেন। এতটুকু মগজ বা কল্পনাশক্তি যদি থাকে ! অথচ মিষ্টিমুখেই করাতে হবে সবকিছু। ভিতর ভিতর যতই অন্তরটিপুনি দিন বাইরেটা সভ্য ভব্য রুচিকর রাখতেই হ’বে। রিসিভারটা যথাস্থানে রেখে বারান্দায় এলেন। বড় বড় সুদৃশ্য টবে অর্কিড - পাতাবাহার - ফনীমনসা - ফার্নের মাঝে গোলাপী ক্যাণ্ডল্উইকের সুজনি ঢাকা ডিভান। নানাবর্ণের কুশনে সাজানো।

ডিভানে দেহ এলিয়ে দিয়ে মিসেস সিকদার ক্লান্ত কণ্ঠে ডাকলেন, “নৈনি ----।”

রান্নাঘর থেকে সাড়া এলো, “জী, মেমসাব!”

ক্ষণপরে ক্রোমিয়ামের সুদৃশ্য ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে নৈনি এলো। ঘাড় বেঁকিয়ে ট্রলির থাকে থাকে সাজানো খাবারগুলো দেখলেন মিসেস সিকদার। খোপকাটা প্লেটে আলগোছে একটু ম্যাকারনি আর কিমার সস্ তুলে নিলেন। আর, দু’চামচ ক্যারামেল পুডিং। হ্যারি অর্থাৎ হরপ্রসাদ সিকদার অফিসেই ওয়ার্কিং-লাঞ্চ খাচ্ছেন ইদানীং। তাতে মিসেস সিকদারের একপক্ষে সুবিধে। নিজের মর্জিমত খাওয়াটা সেরে নিতে পারেন যে কোন সময়ে। সস্ মাখানো ম্যাকারনি এক চামচ মুখে দিয়ে হঠাৎ একটা জরুরী কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। গমনোদ্যত নৈনিকে ডেকে বললেন, “টেলিফোনটা দিয়ে যা তো।”

পালিশ করা কাঠের ট্রে-তে ক্র্যাডেলসুদ্ধু টেলিফোনসেট তুলে আনলো নৈনি। বাড়িতে সবসুদ্ধু তিনটে টেলিফোন। এতবড় বাড়ি, একটা রিসিভার হ’লে রিং শুনে আসবাবপত্রে ঠাঁসা এতগুলো রুমের অলিগলি পেরিয়ে এসে রিসিভার তুলতে তুলতে ও তরফের ধৈর্য ফুরিয়ে যাবে। তিনটে রিসিভার তাই। লম্বা তার। দরকার মত সাময়িক ভাবে অন্যঘর কি বারান্দাতেও নিয়ে যাওয়া যায়।

নৈনি ফোনটা ওঁর পাশে নামিয়ে রেখে চলে যেতে গিয়ে আবার থামলো, “চায় লাউঁ, ইয়া কফি?”

“না - না, এখন কফি খেলে আর ঘুম আসবে না দুপুরে। লেমন-টি দিয়ে যা, আধ চামচ চিনি দিয়ে।”

টেলিফোনে ডায়াল করতে অপর প্রান্তে মিসেস যোশির গলা শোনা গেল।

মিসেস সিকদার বললেন, “রিপ্‌ল্, শোনো। গার্ডেন অফ ইডেনে একটা কটেজও চাই। চারপাই, তোলা উনুন, পিঁড়ি-টিড়ি ---- যাতে একটু রাস্টিক্ টাচ্ আসে আর কি। যোশিকে বলে দু’একটা গরু কিংবা মোষ, গোটা কয়েক ছাগল, মুরগী এইসব জোগাড় করো।”

“সত্যিকারের গরু - ছাগল - মুরগী?” ওদিক থেকে বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করে মিসেস যোশি।

মিসেস সিকদার ঘাড় ঝাঁকিয়ে বব্‌ছাঁট চুলে তরঙ্গ তুলে কণ্ঠে বিরক্তি

চেপে বলে, “সত্যিকারের বইকি! ঠিক আছে মুরগী আর ডিমের ব্যবস্থা আমি করছি। গরু - ছাগলগুলো তুমি আনবে। গরু কিংবা মোষ।” ঠকাস করে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

নৈনিকে ডাকতে যাবার আগেই লেমন-টির কাপ ট্রে-র উপর বসিয়ে নৈনি এগিয়ে এলো।

কাপ নামিয়ে প্লেট - কাঁটা - চামচ সব কিছু গুছিয়ে ট্রলিসুদ্ধু যাবার উপক্রম করতে মিসেস সিকদার হাত নেড়ে থামালেন তাকে, “শোন, কাজ আছে।”

নৈনির মুখটা মুহূর্তে শঙ্কিত দেখালো। একটু অপ্রসন্নও।

মিসেস সিকদার কথা পালটে বললেন, “ছেলেটা কেমন আছে?”

“ছোট?”

নৈনির প্রশ্ন শুনে গা জ্বলে গেল মিসেস সিকদারের, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছোট। যার জ্বর হয়েছে বলে ক’দিন ধরে মাথা খাচ্ছ আমার।”

“জ্বর এখনও আছে।”

“ডিসপিরিনের গুলি আরও কটা নিয়ে যেও। রোজ তিনবার চারবার করে দিও।”

“ওর বাপ বলেছে ডাক্তারকে দেখাতে নিয়ে যেতে।”

“তা যাক্ না। ডাক্তারের কাছে ছেলেকে নিয়ে যেতে পারবে ওর বাপ?”

“ওর ছুটি কোথায় মেমসাব? দশটা পাঁচটা ডিউটি। বিকেলে আপনার বাংলোয় মালীর কাজ। তাছাড়া হাসপাতাল তো পাঁচটায় বন্ধ হয়ে যায়। লম্বা লাইন দিয়ে রুগী দেখাতে তিন চার ঘণ্টার ধাক্কা। কাল ছেলে দু’টোকে নিয়ে সকাল বেলা হাসপাতালে যাবো আপনার এখানে ঝাড়া পোঁছা, বাসনমাজা সেরে। ওর বাপ সাইকেলে আমাদের ছেড়ে আসবে। আবার দুপুরে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাবে।”

মিসেস সিকদারের মুখখানা থমথমে হয়ে গেল। রগ দু’টো দপ্‌দপ্ করতে লাগলো। নিজেকে শান্ত করার সময় নিতেই বুঝি কথান্তরে গেলেন।

“দু’টো ছেলেকে নিয়ে যাবে কেন? আরেক জনের কি হ’ল আবার?”

“মেজটার কান দিয়ে আবার পুঁজ বেরোচ্ছে। ভীষণ ব্যথা কানে।”

“ওষুধ কিছু দাওনি?”

সরলমনে জবাব দেয় নৈনি, “ওই যে বড়িগুলো আপনি দিয়েছেন ওকে কাল দু’বার দিলাম। সকালেও দিয়ে এসেছি একটা।”

মুহূর্তে বোমার মত ফেটে পড়লেন মিসেস সিকদার, “এই, এই জন্যেই জ্বর সারেনি ছোট ছেলেটার। ওর খোরাকের ওষুধ তুই অন্য ছেলেটাকে দিয়ে খাওয়াচ্ছিস্। এদিকে রোজ কত হ্যানাই প্যানাই! আবার সারাদিন হাসপাতালে বসে কাটানোর প্রোগ্রাম করা হয়েছে। বলি বাড়ির কাজগুলো কে করবে, অ্যাঁ? এই পরিষ্কার বলে দিচ্ছি নৈনি, বিষ্যুৎবার রাত্তিরে লেডীজ ক্লাবের ফাংশন আছে। এর মধ্যে তুমি যদি একবেলাও কামাই করেছো তো তোমার মরদের চাকরির বারোটা বাজিয়ে ছাড়বো আমি, হ্যাঁ। বিষ্যুৎবারের পর দু’টো ছেলে কেন গুষ্টিবর্গকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে পড়ে থাকো গিয়ে যতক্ষণ খুশি।”

নৈনি নিঃশব্দে ট্রলি নিয়ে চলে গেল। মিসেস সিকদার নিজের মনে খানিক কটূক্তি করে বেডরুমে এসে জানলার ভারী পর্দাগুলো টেনে দিয়ে শয্যায় লুটিয়ে পড়লেন। খানিক পরেই হালকা সুখসুপ্তিতে লীন হয়ে গেলেন রাজ্যের ভাবনা চিন্তা ভুলে ----।

দেখতে দেখতে বিষ্যুৎবার এসে গেল। এলো উৎসব রজনী। মেসের সামনে প্রকাণ্ড লনটাকে আর চেনা যায়না। গাছ গাছালিতে ভরে গেছে। ডালপালা সমেত বড় বড় গাছ অন্যত্র বাগান খালি করে উপড়ে এনে সারি সারি পোঁতা হয়েছে। পাতাগুলো এখনও সতেজ। ডালপালার আড়াল আবডাল থেকে অসংখ্য রঙীন বাল্ব মায়াবী আলো-ছায়া বিকীর্ণ করছে চারিদিকে। ডালে ডালে আপেলের ছড়াছড়ি। ভারী সিল্কের শাড়ি দিয়ে বানানো কতিপয় কৃত্রিম গুহা ঝলমল করছে এখানে ওখানে। একপাশে একটা কুটিরের প্রাঙ্গনে একজোড়া গাইগরু বিচালি চিবোচ্ছে। ক’টা ছাগল যদৃচ্ছ বিচরণ করছে। মুরগীর পাল কয়েক ডজন ডিমের হাট সাজিয়ে চিৎকারে সভা মাৎ করছে। নেপথ্যে গুপ্ত মিউজিক সিস্টেম থেকে পরিবেশিত হ’চ্ছে পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রের ঐক্যতান।

মহিলারা এসে পড়েছেন সাতটার আগেই। আজকের এই পতি বিনোদন রজনীতে তাঁরাই হস্টেস। অতিথি হ’লেন স্বামীরা। সমবেত ইভ্‌রা মিলে করবেন আদমদের বিনোদন। সৃষ্টির আদিমকাল থেকে যা চলে আসছে। বলতে গেলে সমস্ত সৃষ্টির উৎসই তো তাই। মনে মনে নিজেকে বাহবা দিলেন মিসেস সিকদার। থীমটা দারুণ ----। মহিলাদের পরনে বগলকাটা সেমিজ। বুক ও তলপেটে সেফটিপিন দিয়ে তিনটি পানের পাতা আটকানো আছে, ফিগলিফের বিকল্প হিসাবে। সাড়ে সাতটা নাগাদ পতিদের আনাগোনা শুরু। শর্টস্ পরে উৎসবে আসবে তারা। পানপত্রটি ক্রীড়াঙ্গনে প্রবেশের মুখে হাতে হাতে দেওয়া হ’বে। দ্বারদেশে ঘেরাটোপের মধ্যে ঢুকে তারা নিজের নিজের পরিধেয়ে পান পাতা আটকে নিয়ে গার্ডেন অফ ইডেনে অবতীর্ণ হবে।

মিসেস সিকদারের রগদু’টো দপদপ করতে থাকে। গুহাভ্যন্তরে গিয়ে টপাটপ দু’টো ডিসপিরিনের গুলি খেয়ে নেন। আরও ছ’টা গুলি খেয়েছেন আগেই। সপ্তম আর অষ্টম খেলেন এখন। ফুর্তির জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়েছে সবাই। এই ফুর্তির রসদ জোগাতে যে কি প্রাণান্তকর পরিশ্রম গেছে ক’দিন তা জানেন শুধু মিসেস সিকদার। আজ আবার নৈনিও আসেনি। কাল ছোট ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করেছে। অত করে বলা সত্ত্বেও আর একটা দিন সবুর সইলো না তার। নেমকহারাম আর বলে কাকে ! অথচ ওর স্বামী জয়কিষণকে সিকদারই চাকরি দিয়েছেন। স্ত্রীর সনির্বন্ধ অনুরোধে। সেই চাকরির গরমেই নৈনির এত সাহস আজ। যাক্ মিসেস সিকদারও ওকে ঠাণ্ডা করার দাওয়াই জানেন। জয়কিষণের পাকা চাকরি কাঁচাতে এমন কিছু কাঠখড় পোড়াতে হ’বে না তাঁকে।

তফাতে লতাগুল্মঘেরা উদ্যানে দাঁড়িয়ে ব্যাণ্ডবাদকেরা বাদ্যসঙ্গীত পরিবেশন করছে। সঙ্গীতের মাদক মূর্ছনায় ভারী হয়ে আছে আকাশ বাতাস। ভাণ্ডারকরের কাঁধে হাত রেখে অঙ্কিতভুরু রক্তিমঅধরে অলৌকিক মায়া জাগিয়ে মনে মনে মিসেস সিকদার তাঁর বেদনার্ত মস্তক আঁতিপাঁতি করে নানা কথা মনে রাখার চেষ্টা করছেন। মস্তিষ্ক তো নয় কমপিউটার একখানা। প্রকাণ্ড একটা কার্যসূচীর প্রতিটি অংশ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে রেকর্ড করা সেখানে। এতগুলো মানুষের পানভোজন - নৃত্যগীত - রসালো আলাপন। আপাতদৃষ্টিতে স্বতঃস্ফুর্ত এই প্রবাহের মূলে আছে

সুদীর্ঘ, ব্যাপক পরিকল্পনা, সুষ্ঠু পরিচালনা এবং প্রাণপাত পরিশ্রম। বাঁহাতের মণিবন্ধে ফুলের মালার আড়ালে ডিজিটাল ওয়াচে সময় দেখলেন মিসেস সিকদার।

গুহার দ্বারদেশে মিসেস ভাণ্ডারকরের আবির্ভাব ঘটলো। নৃত্যরত জুটিদের ভিড় কেটে এদিক পানেই অগ্রসর হচ্ছেন। মিসেস সিকদারের ক্ষীণকটি তখন ভাণ্ডারকরের বাহুবেষ্টনে বন্দী।

মিসেস ভাণ্ডারকর বিকারহীন মুখে এগিয়ে এসে মিসেস সিকদারের কর্ণদেশে মৃদুভাষে বললেন, “খাবার দিতে বলি?”

মিসেস সিকদার ততোধিক মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ - হ্যাঁ। দেড়টা বেজে গেছে, এবার দিয়ে দাও।”

নীল সবুজ কাঞ্জিভরমের পর্দা সরে যেতে গার্ডেন অফ ইডেনে ভোজবাজির মত টেবিলের সারি দেখা দিল। নিষ্কলুষ শ্বেতশুভ্র চাদরের উপর বড় বড় চিনেমাটির পাত্রে নানান ভোজ্যবস্তুর সমাবেশ। শ্বেতপোষাকে বেয়ারাগুলোকে মনে হচ্ছে যেন ভুঁইফোড় ভূতের দল। শাড়ির আড়ালে এতক্ষণ ধরে ওদের কার্যকলাপ কেউ লক্ষ্যও করেনি, এমন অদ্ভুত কৌশলে মিশে গেছিল সব কিছু সেই পৌরাণিক সপ্নারণ্যে। খাবার দেখে এক জোটে সেদিক পানে ধাওয়া করলো সবাই। ঠুনঠান - ঠন - ঠনাৎকারের মাঝে দপ করে একসঙ্গে সব কটা আলো নিভে গেল। নিশ্ছিদ্র ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। চতুর্দিকে কি হ’ল কি হ’ল রব।

সিকদার গর্জন করে উঠলেন, “ভাণ্ডারকর!”

বিজলী-ভাণ্ডারের চাবিকাঠি তার হাতে। কিন্তু ডজনখানেক পেগ পান করে ভাণ্ডারকর তখন অন্য ব্যক্তি। গার্ডেন অফ ইডেনে সেও দস্তুরমত আদম একজন। সিকদারের দাবড়ানি শুনে পিছপা হ’বার পাত্র নয়। অতএব সেই অন্ধকারের অন্তরীক্ষ থেকে বাকযুদ্ধে লেগে গেল দুই মহারথী। শব্দভেদী বাক্যবান হেনে। হুলস্থুল কাণ্ড শুরু হ’ল।

মিসেস সিকদার আকুল কণ্ঠে ডেকে উঠলেন, “প্লীজ -, প্লীজ -, ডার্লিং।”

আর ডার্লিং! অদৃশ্য রণাঙ্গনে তখন ক্লাইম্যাক্স ছুঁই ছুঁই ----।

সভা ভঙ্গ হ’ল। গাছের পাতাগুলো কুঁকড়ে শুকিয়ে গেছে।

পানপাতার আচ্ছাদন অধিকাংশই স্থানচ্যুত হয়েছে কখন। মিসেস সিকদার মহিলা কর্মীদের নিয়ে উৎসব শেষে তাঁবু গোটানোর তদারকে ব্যস্ত। এখনও অনেক কাজ বাকি। নুয়েপড়া গাছগুলো থেকে সুতো খুলে আপেল নামিয়ে ঝুড়ি বোঝাই করতে হ’বে। গরু - ছাগল - মুরগীদের ফেরৎ পাঠাতে হ’বে হিসেব মিলিয়ে। গরু ছাগল নিয়ে সমস্যা নেই। সমস্যা মুরগীর। রাতের অন্ধকারে, বিজলী বাতীর তিরোধানের সুযোগ নিয়ে কোথায় যে উপে গেছে তারা এবং মুরগীগুলোর অন্তর্ধানের পিছনে কারসাজি কার বা কাদের তা অনুমানসাপেক্ষ। এমনকি ডিমগুলোরও আর হিসেব মিলছে না। বেশ কিছু ডিম পাচার হয়ে গেছে। এ ছাড়া ভাঙা গ্লাস - প্লেট, খোঁচ লাগা কাঞ্জিভরম, সে সব তো আছেই। ভাগ্যিস শেষোক্ত জিনিসগুলোর জন্যে লেডীজ ক্লাব থেকে খেসারৎ দিতে হ’বে না।

বাড়ি পৌঁছে দেখলেন সিকদার কখন অফিস চলে গেছেন। কথা ছিল আজকের দিনটা ছুটি থাকবে সবার কিন্তু শেষমুহূর্তে বিজলী বিপর্যয়ের কেলেঙ্কারিটা হয়ে সব ভেস্তে গেল। সিকদার নিশ্চয়ই তারই জের টানছেন অফিসে গিয়ে। ভাণ্ডারকরকে ভালমত ফাঁসাবার জন্যে আঁটঘাঁট বাঁধছেন। এতটা বাড়াবাড়ি না করলেও চলতো। স্বর্গোদ্যানে অকালে আঁধার নামাটা এমন কি আর সাংঘাতিক অপরাধ! এসব উৎসবে অন্ধকারই তো খোঁজে সবাই। উপরি কিছু প্রাপ্তির সুযোগ সুবিধায়। শুধু একটু সময়ের উনিশ বিশ হয়ে গেছে। ঠিক খাবার সময়ের বদলে আর একটু আগে কিংবা পরে ঘটলে অনর্থক তুমুল বাঁধতো না সামান্য ব্যাপারটাকে নিয়ে। তাছাড়া একটু পানাধিক্যও ঘটেছিল। সিকদার আর ভাণ্ডারকর দু’জনেই এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত। দু’জনকেই বিশেষ অন্তরঙ্গ ভাবে জানেন মিসেস সিকদার।

কালকের ঘটনাগুলো ---- সেগুলো আগাগোড়াই অপ্রীতিকর নয় তাবলে ---- এক ঝাঁক পায়রার মত এসে বসে তাঁর মনের আঙিনায়। সর্বাঙ্গে হঠাৎ এক মৃদু উত্তেজনা অনুভব করেন মিসেস সিকদার। বেডরুমে এসে ভারী পর্দাগুলো সরিয়ে দেন। এক কাপ কড়া কফি পেলে হ’ত। একটু ঝরঝরে লাগতো শরীরটা। তারপর স্নান করে কিছু খেয়ে নিয়ে শুতে পারতেন একেবারে। রান্নাঘরে সিঙ্কবোঝাই বাসনের কাঁড়ি। সারা ঘর থই থই করছে। ক্ষিপ্রহাতে সার্‌ভেন্টস্ কোয়ার্টারের কলিংবেল

টিপলেন। একবার, দু'বার। তৃতীয়বারে টিপেই রাখলেন খানিকক্ষণ। কাকস্য পরিবেদনা। কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না ওদিক থেকে। ড্রয়িং রুমের টেলিফোন বেজে উঠলো। রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই স্বামীর কণ্ঠস্বর কানে এলো।

তিনি কিছু বলার আগেই মিসেস সিকদার রুদ্ধশ্বাসে বলে গেলেন, "শোনো, নৈনি আজও কাজ করতে আসেনি। বেল বাজালাম তবু দেখা নেই। কোয়ার্টারেই নেই সম্ভবত।"

সিকদার বললেন, "জানি, সেইকথা বলতেই ফোন করলাম। এইমাত্র জয়কিষণ এসেছিল। অফিসে চারদিনের ছুটি চাইতে। ওর ছেলেটা কাল হাসপাতালে মারা গেছে।"

"ওরা এখন আছে কোথায়?"

"ওর দিদির বাড়িতে। সেখানেই ক্রিয়াকর্ম সব চুকিয়ে তারপর ফিরবে। সেটাই ভাল। আমাদের কোয়ার্টারে এসে এসব করলে ভারী বিশ্রী লাগবে।"

মিসেস সিকদার শিউরে উঠে বললেন, "না - না, আমাদের এখানে ওসব চলবে না।"

"সেইজন্যেই তো। চারদিনের ছুটি দিয়েছি। এক্ষেত্রে ছুটি না দিয়েও তো উপায় নেই। বিশেষ করে ক্লাশ ফোর এমপ্লয়িদের। দারুণ একটা বদনাম রটে যাবে ফট্ করে।"

"তার মানে নৈনি আরও কিছুদিন আসবে না।"

"চারদিন তো বটেই। তারপরেও, জয়কিষণ অফিসে এলেই যে ওর বউও সেদিনই কাজে যাবে এমন কোন কথা নেই। তুমি বরং তদ্দিনের জন্যে অন্য লোকের খোঁজ করো।"

"সে তো করতেই হ'বে। ঝি ছাড়া আমার একবেলাও চলবে না।"

ফোন রেখে সোফার অগ্রভাগে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন মিসেস সিকদার। তাঁর চোয়ালটা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠলো। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে টেলিফোনের উপর ঝুঁকে পড়ে ক্ষিপ্রহাতে একটা নাম্বার ডায়াল করতে লাগলেন।